কুরআনে ঘোষিত মুসলিম শাসকদের ৪ দফা কর্মসূচী

অধ্যাপক গোলাম আযম

কুরআনে ঘোষিত
মুসলিম শাসকদের ৪ দফা কর্মসূচী

অধ্যাপক গোলাম আযম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.amarboi.org

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ১৯৩

৫ম প্রকাশ

মহররম	১৪২৪
চৈত্র	১৪০৯
মার্চ	২০০৩

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৬.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

QURAN-A GHOSHITO MUSLIM SHASHAKDER CHAR DAFA KARMASHUCHE by Prof. Ghulam Azam. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Fixed Price : Taka 6.00 Only.

www.amarboi.org

বিষয়-সূচী

১।	এ বইটির উদ্দেশ্য	৫
২।	সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার রচিত বিধানই ইসলাম	৭
৩।	ইসলাম পূর্ণাংগ জীবন বিধান	১০
৪।	ইসলামের সবটুকুই মানতে হবে।	১১
৫।	রাসূল (সা)–এর জীবনই ইসলামের বাস্তব রূপ	১২
৬।	এ ব্যাখ্যা আলেম সমাজ দেন না কেন?	১৪
৭।	আধুনিক শিক্ষিতদের দায়িত্ব	১৫
৮।	মুসলিমের প্রথম কর্তব্য	১৬
৯।	মুসলিমের দ্বিতীয় কর্তব্য	১৯
১০।	মুসলিমের তৃতীয় কর্তব্য	১৯
১১।	মুসলিম শাসকদের ৪–দফা কর্মসূচী	২০
১২।	প্রথম দফা ঃ চরিত্র গঠন করা	২২
১৩।	দ্বিতীয় দফা ঃ ইনসাফপূর্ণ অর্থব্যবস্থা কায়েম করা	২৬
১৪।	তৃতীয় দফা জনকল্যাণ মূলক কাজ চালু করা	৩০
১৫।	চতুর্থ দফা ঃ অনিষ্টকর কাজ বন্ধ করা	৩২
১৬।	সব রাসূলের একই দায়িত্ব	৩৫
১৭।	শেষ কথা	৪০

www.amarboi.org

এ বইটির উদ্দেশ্য

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর থেকে এ পর্যন্ত (১৯৯২) যে মুসলিম শাসকগণ বাংলাদেশে সরকারী ক্ষমতা ভোগ করেছেন তারা কুরআনের আইন চালু করার সামান্য ইচ্ছাও পোষণ করেছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কারণ তাদের সবাই চিন্তা ও কর্মে ধর্ম-নিরপেক্ষ। তাদের কেউ ঢাকঢোল পিটিয়ে রাজনীতি থেকে ধর্মকে উৎখাত করেছেন। কেউ শাসনতন্ত্রে 'বিস্‌মিল্লাহ' ও 'আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা' যোগ করেছেন এবং দলীয় ম্যানিফেস্টোতে ইসলামী মূল্যবোধ শামিল করেছেন। আবার কেউ ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু বাস্তবে ইসলামী রাষ্ট্র ও আল্লাহর আইন কায়েমের কথা কেউ বলেননি।

ইসলামী রাষ্ট্র, আল্লাহর আইন ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ কায়েমের পক্ষে কথা না বললেও তারা সবাই মুসলিম। যে শিক্ষা ব্যবস্থায় তারা গড়ে উঠেছেন তাতে কুরআন ও হাদীসের গভীর অধ্যয়ন দূরের কথা। ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি স্বচ্ছ জ্ঞান লাভেরও সুযোগ তারা পাননি।

তাই কুরআনে ঘোষিত মুসলিম শাসকদের ৪-দফা কর্মসূচী বইটির প্রথম অংশে ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করেছি। এ আলোচনা যাদের অন্তর খোলা মনে গ্রহণ করবে তাদের নিকট এ বই-এর আবেদন যুক্তিগ্রাহ্য বিবেচিভ হবে বলেই আমার আশা।

আমার মতোই যারা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ডিগ্রী লাভ করা কালে কুরআনের আলো সংগ্রহ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকার ফলে নিজকে মুসলমান মনে করা সত্ত্বেও ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে পারেননি তাদের প্রতি আমার স্বাভাবিক দরদের অনুভূতিই এ বই লিখতে আমাকে বাধ্য করেছে।

www.amarboi.org

সরকারী, আধা–সরকারী, বেসরকারী বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মকর্তা, অধ্যাপক, আইনজীবী, সাংবাদিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী ইত্যাদি শিক্ষিত মহল ইসলাম ও ইসলামী শাসন সম্পর্কে অল্প পরিশ্রমে ও কম সময়ে যাতে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ধারণা লাভ করতে পারেন সে উদ্দেশ্য নিয়েই এ বইটি রচিত।

আমাদের যোগ্য শিক্ষিত লোকেরা ইসলামের এ উজ্জ্বল আলোকে নিজেদের মন মগজকে আলোকিত করতে এগিয়ে এলে তারা আলেম সমাজ থেকেও দ্বীনের খেদমত বেশী করতে সক্ষম হবেন। কারণ তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমন অবস্থানে আছেন যেখানে অনেক অধীনস্থ লোক তাদের কাছ থেকে কুরআনের আলো পেয়ে ধন্য হতে পারে।

যাদের জন্য এ বইটি লেখা হলো তাদের খেদমতে আমার আরয যে, বইটি পড়ে যদি মনে কোন প্রশ্ন জাগে বা–তারা কোন খট্‌কা বোধ করেন তাহলে আমাকে নিম্ন ঠিকানায় জানালে আমি তাদেরকে জওয়াব দেবার চেষ্টা করব ইন–শা–আল্লাহ।

রচনা ঃ
সফর ১৪১৩
আগষ্ট–১৯৯২
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার

গোলাম আযম
১১৯, কাযী অফিস লেন,
মগবাজার,
ঢাকা–১২১৭

www.amarboi.org

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার রচিত বিধানই ইসলাম

মহাবিশ্বের কোথাও কোন অনিয়ম ও বিশৃংখলা নেই। মহাজ্ঞানী ও মহা কৌশলী স্রষ্টা সর্বত্র মযবুত নিয়মের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছেন। এ নিয়ম ভংগ করার সাধ্য কারো নেই। তিনি তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির জন্যই এর উপযোগী ও প্রয়োজনীয় বিধি বিধান বা নিয়ম কানুন রচনা করেছেন। সূর্যের মতো বিরাট সৃষ্টি থেকে ক্ষুদ্রতম সৃষ্টি অণু পর্যন্ত প্রতিটি সৃষ্টি স্রষ্টার রচিত বিধান মেনে চলছে। মানুষের দেহও আল্লাহরই তৈরী নিয়ম মেনে চলে। কারণ তিনি সবাইকে তার আইন মানতে বাধ্য করেছেন। এ সব বিধান তিনি নবীর মাধ্যমে পাঠাননি। তিনি সরাসরি এ সব আইন জারী করেন। তাই অমান্য করার সাধ্য কারো নেই।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তার খলীফা বা প্রতিনিধির মর্যাদা দিতে চেয়েছেন বলে তাকে ইচ্ছা ও চেষ্টার বেলায় স্বাধীনতা দিয়েছেন। অবশ্য কর্মসম্পন্ন করা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। মানুষকে শুধু ইচ্ছা ও চেষ্টার জন্য দায়ী করা হবে। ভাল ও মন্দ সম্পর্কে সহজাতভাবেই মানুষকে যে চেতনা দেয়া হয়েছে তা মানুষের বস্তুসত্তার উর্ধের এক মহান সৃষ্টি। কুরআনের ভাষায় যাকে 'রূহ' বলা হয়েছে তা-ই মনুষ্যত্ব ও নৈতিক সত্তা। আমরা বিবেক বললে সহজে যা বুঝি তা-ই রূহ। এ বিবেক বা নৈতিকতা বোধ মানুষকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' বা সৃষ্টির সেরা হওয়ার মর্যাদা দিয়েছে।

কিন্তু ভাল ও মন্দের চেতনা দিয়ে আল্লাহ পাক মানুষকে যা ভাল তা করতে বাধ্য করেননি এবং মন্দ করা থেকে জোর করে ফিরিয়েও রাখেন না। যদি তা করতেন তাহলে আর সকল সৃষ্টির মতোই বাধ্য হয়ে মানুষকেও আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হতো। প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব দেবার কারণেই মানুষকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। এ দায়িত্ব পালন করলে পুরস্কার পাবে, আর

www.amarboi.org

পালন না করলে শাস্তি পাবে। যাদেরকে আল্লাহর বিধান মানতে বাধ্য করা হয়েছে তাদের বেলায় পুরস্কার ও তিরস্কারের কোন প্রশ্নই উঠে না। বাধ্য হয়ে মেনে চলছে বলে মানার মধ্যে তাদের যেমন কোন ক্রেডিট বা বাহাদুরী নেই। তেমনি অমান্য করার অপরাধে তারা দোষীও সাব্যস্ত হতে পারে না।

মানবজাতির জন্য রচিত যে বিধান নবীর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে আল্লাহ নিজেই এর নাম দিয়েছেন 'ইসলাম'। ইসলাম শব্দটির এক অর্থ হলো আত্মসমর্পণ, অপর অর্থ হলো শান্তি। সকল সৃষ্টি যেমন আল্লাহর বিধানের নিকট আত্মসমর্পণ করে শান্তিতে আছে। মানুষকেও শান্তি পেতে চাইলে নিজের ইচ্ছায়ই আত্মসমর্পণ করতে হবে। মানুষকে আর সব সৃষ্টির মতো আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হয়নি বলে আল্লাহর বিধান অমান্য করে দুনিয়ায় চরম অশান্তি ভোগ করছে। আল্লাহ বলেন ঃ

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ -

"জলে-স্থলে যে বিশৃংখলা ও অশান্তি বিরাজ করছে তা মানুষেরই হাতের কামাই।" (সূরা আর রূম ৪১ আয়াত)

আল্লাহর বিধানকে অগ্রাহ্য করে মানুষ নিজেদের মনগড়া নিয়ম-কানুন চালু করেই এই অশান্তির শিকার হয়েছে। তাই আল্লাহ প্রশ্ন তুলেছেন ঃ

اَفَغَيْرَ دِيْنَ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ -

"মানুষ কি আল্লাহর বিধান ছাড়া আর কোথাও বিধান তালাশ করে? অথচ আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবাই তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। আর মানুষ তো তারই কাছে ফিরে আসবে।"

(সূরা আলে ইমরান ৮৩ আয়াত)

উপরোক্ত আয়াতে "আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবাই তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ করেছে" কথাটিতে "আত্মসমর্পণ করেছে" বাক্যাংশটির জন্য

www.amarboi.org

আরবীতে "ওয়া লাহু আসলামা" বলা হয়েছে। অর্থ ইসলাম গ্রহণ করেছে বা আত্মসমর্পণ করেছে। এ থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, জিন ও মানুষ ছাড়া সকল সৃষ্টিই ইসলাম গ্রহণ করেছে। অবশ্য তারা সবাই বাধ্য হয়েই তা করেছে। তাহলে বুঝা গেল যে, প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য আল্লাহ্ পাক যে বিধান রচনা করেছেন তা ঐ সৃষ্টির ইসলাম। অর্থাৎ সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার রচিত বিধানেরই নাম ইসলাম। কিন্তু এ ইসলাম নবীর মাধ্যমে পাঠান হয়নি। আল্লাহ সরাসরি তা চালু করেছেন।

মানুষের জন্য আল্লাহর রচিত বিধান তিনি নিজেই চালু করবেন না বলে তা নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন এবং তা জারী করার জন্য নবী ও নবীর প্রতি ঈমানদারদের উপর দায়িত্ব দিয়েছেন। আল্লাহর ঐ বিধান তাঁর পক্ষ থেকে যারা কায়েমের চেষ্টা করে তাদেরকেই তিনি তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধির মর্যাদা দান করেন। আইন আল্লাহরই বটে কিন্তু তা জারী করার দায়িত্ব তাঁর প্রতিনিধিদের উপর ন্যস্ত।

মানুষ যাতে আল্লাহর বিধানের অভাবে অশান্তির শিকার না হয়ে পড়ে সে কারণেই দুনিয়ায় প্রেরিত প্রথম মানুষটিকে তিনি নবী হিসাবেই পাঠিয়েছেন। দুনিয়ায় মানুষের অস্তিত্ব যত প্রাচীন ইসলামও তত প্রাচীন। আল্লাহ পাক ইসলামকে 'দ্বীন' আখ্যা দিয়েছেন। দ্বীনের শাব্দিক অর্থ আনুগত্য। সকল নবী ও রাসূলই নিজে আল্লাহর আনুগত্য করেছেন ও মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহর আনুগত্যের জন্য যে বিধান বা আইন–কানুন দেয়া হয়েছে এর বিশেষ নাম হলো 'শরীয়াত'। শরীয়াতের শাব্দিক অর্থও আইন। সকল নবীর দ্বীনই ইসলাম। অবশ্য শরীয়াতে প্রয়োজন মতো আল্লাহ নিজেই পরিবর্তন করেছেন। আল্লাহর রচিত শরীয়াতের সর্বশেষ সংস্করণ শেষ নবী ও বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। এ কথাই আল্লাহ ঘোষণা করেছেন ঃ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

"আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র দ্বীন।" (আলে–ইমরান ১৯ আয়াত)

www.amarboi.org

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا –

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণতা দান করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসাবে দিয়ে সন্তুষ্ট হলাম।"

(সূরা আল-মায়েদা ৩ আয়াত)

ইসলাম পূর্ণাংগ জীবন বিধান

ইসলাম মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার জীবনের সব ক্ষেত্রেই বিধান দান করেছে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সকল পর্যায়েই মানুষের সঠিক বিধান অত্যন্ত প্রয়োজন। বিধি বিধান ছাড়া মানুষের জীবন কিছুতেই চলতে পারে না। তাই আল্লাহ পাক মানুষকে অন্ধকারে হাতড়িয়ে মরা থেকে রক্ষা করার জন্যই পূর্ণাংগ জীবন বিধান দিয়ে এ সবটুকু মেনে চলার নির্দেশও দান করেছেন।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً ص وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط

"হে ঐ সব লোক যারা ঈমান এনেছ, তোমরা ইসলামের সবটুকু কবুল কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না।"

(সূরা আল-বাকারাহ ২০৮ আয়াত)

এর স্পষ্ট ব্যাখ্যা এটাই হয় যে, জীবনের সব ব্যাপারেই ইসলামী বিধান মেনে চল। যদি কোন এক ক্ষেত্রেও ইসলামী বিধান না মান তাহলে অন্য কোথাও থেকে ঐ ক্ষেত্রে বিধান নিতে বাধ্য হবে। তবে জেনে রাখ যে,

www.amarboi.org

আল্লাহ ছাড়া আর যেখান থেকেই বিধান নেবে তা শয়তানের মরযী মতোই হবে। কারণ শয়তানের প্ররোচনায়ই আল্লাহর বিধান ত্যাগ করা হয় যাতে সেখানে তার বিধান গ্রহণ করা হয়। এক কথায় ইসলামী বিধানের বিকল্প বা বিপরীত সব বিধানই ইবলীসের অবদান।

এখানে আরও একটু সূক্ষ্ম প্রসংগ রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে নিজে মালিক বা মনিব হওয়ার অধিকার দেননি। মানুষকে সর্ব অবস্থায়ই একমাত্র খলীফা বা প্রতিনিধির ভূমিকাই পালন করতে হয়। হয় সে আল্লাহর খলীফা হয়ে চলবে, আর না হয় 'ইবলীস সাহেবের' খলীফার মর্যাদা'ই তাকে বহন করতে হবে।

ইসলামের সবটুকুই মানতে হবে

যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে তাকে মুসলিম বলা হয়। সত্যিকার মুসলিম তার জীবনের সবক্ষেত্রেই মুসলিম হিসাবে জীবন যাপন করার চেষ্টা করে। ইসলামের চিন্তাধারা বিধান ও শিক্ষার বিরোধী কোন মত ও পথ সে কখনও গ্রহণ করতে রাযী নয়। এটা একেবারেই অযৌক্তিক যে, এক ব্যক্তি ধর্মীয় ক্ষেত্রে মুসলিম, রাজনৈতিক ময়দানে ধর্মনিরপেক্ষ, অর্থনীতিতে কমিউনিষ্ট, সংস্কৃতিতে ভোগবাদী, চিন্তাজগতে বস্তুবাদী ইত্যাদি। মুসলিম হওয়ার দাবীদার হলে সকল ক্ষেত্রেই ইসলামের অনুসারী হতে হবে। অর্থাৎ সব অবস্থায়ই মুসলিম হতে হবে।

নিজের খেয়াল খুশী মতো ইসলামের যতটুকু পছন্দ তা মেনে চলা এবং যে অংশ পছন্দ নয় তা ত্যাগ করার কোন অধিকারই আল্লাহ স্বীকার করেন না। ইসলামী বিধান মানুষের নিকট আল্লাহর কোন দরখাস্ত নয় যে, যার যতটুকু ইচ্ছা মনযুর করবে এবং যা পছন্দ নয় তা নাকচ করবে। এ বিষয়ে আল্লাহ কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন ঃ

www.amarboi.org

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ط–

"তোমরা কি আল–কিতাবের কিছু অংশের উপর ঈমান এনেছ আর কিছু অংশকে অস্বীকার করছ? যারা এমনটা করে তাদের জন্য দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে কঠিন আযাব ছাড়া আর কী প্রতিদান থাকতে পারে?" (সূরা আল–বাকারা ৮৫ আয়াত)

রাসূল (সাঃ)-এর জীবনই ইসলামের বাস্তব রূপ

ইসলামের পূর্ণাংগতা ও ব্যাপকতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে হলে একথা জানতে হবে যে, রাসূল (সাঃ)-এর উপর অহী নাযিল হওয়া শুরু হবার পর থেকে তাঁর ২৩ বছর দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের সবটুকুই ইসলাম। তাঁর জীবনই ইসলামের বাস্তব রূপ। তিনিই জীবন্ত কুরআন। আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে সার্টিফিকেট দিয়ে বলেছেন ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى ۝

"তিনি মনগড়া কথা বলেন না, যা বলেন তা অহী ছাড়া আর কিছুই নয়।" (সূরা আন্–নাজ্‌ম ৩–৪ আয়াত)

রাসূল (সাঃ)–এর কথা, কাজ ও অনুমোদন সবই অহীর দ্বারা পরিচালিত। এ কারণেই তিনি নির্ভুল। আল্লাহকে যেমন অন্ধভাবে মানতে হয়। রাসূলকেও সেভাবে মানার নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ط

www.amarboi.org

"কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর এ ইখতিয়ার নেই যে, যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়সালা করেন তখন তারা ঐ বিষয়ে নিজেদের মত খাটায়।" (সূরা আল-আহযাব ৩৬ আয়াত)

আসল কথা হলো, রাসূল (সাঃ) ইসলামের মূর্ত প্রতীক। তাঁর জীবনেই ইসলাম বাস্তব রূপ লাভ করে। তাঁকে অনুসরণ ও অনুকরণ করা মানেই আল্লাহর আনুগত্য ও ইসলামের অনুশীলন। তাই আল্লাহ ঘোষণা করেছেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"রাসূলুল্লাহর মধ্যেই তোমাদের জন্য সুন্দরতম আদর্শ রয়েছে।"

(সূরা আল-আহযাব ২১ আয়াত)

তিনি সকলের জন্যই মহান ও শ্রেষ্ঠ আদর্শ। উন্নত মানের মানুষ হতে চাইলে তাকেই নমুনা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তিনি আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতা, আদর্শ প্রতিবেশী, আদর্শ বন্ধু, আদর্শ ব্যবসায়ী, আদর্শ শাসক, আদর্শ আইনদাতা, আদর্শ বিচারক, আদর্শ যোদ্ধা, আদর্শ সেনাপতি, আদর্শ চুক্তি--পালক, এমন কি দুশমনের সাথে আচরণেও আদর্শ।

তিনি সব অবস্থায়ই রাসূল হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মসজিদের ইমামতী করার সময় যেমন তিনি রাসূল ছিলেন, শাসন ক্ষমতা প্রয়োগের সময়ও রাসূলই ছিলেন। ধর্মীয় ক্ষেত্রে রাসূল আর রাজনীতি, শাসন, বিচার ও যুদ্ধে তিনি রাসূল ছিলেন না— এমন দাবী করার সাধ্য কারো নেই। তাই তাঁকে রাসূল হিসাবে অনুসরণ করতে হলে জীবনের সব ব্যাপারে ও ক্ষেত্রেই তাঁকে মেনে চলতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সাঃ)-কে যে বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার দিয়েছেন তা চির আধুনিক ও শাশ্বত। এমন নয় যে, আল্লাহ পাক রাজনীতি ও অর্থনীতি বুঝেন না বা এ বিষয়ে যে সব বিধান দিয়েছেন তা আধুনিক যুগে অচল। কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা সর্বকালের সকল মানুষের জন্য একমাত্র ভারসাম্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী।

www.amarboi.org

আল্লাহ, রাসূল, কুরআন ও ইসলাম সম্পর্কে যাদের সঠিকভাবে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ হয়নি তারাই ইসলামকে প্রগতি বিরোধী ও উন্নয়নের পথে বাধা মনে করেন। অথচ ইসলামই সত্যিকার প্রগতির পথ দেখায় এবং মানব সমাজকে সর্বদিক দিয়ে উন্নতির পথে পরিচালিত করতে সক্ষম।

এ ব্যাখ্যা আলেম সমাজ দেন না কেন?

গত আড়াই'শ বছর সরকারী সহায়তা ছাড়াই মুসলিম জনগণের সাহায্যে আমাদের আলেম সমাজ মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে কুরআন ও হাদীসকে যে বাঁচিয়ে রেখেছেন এর জন্য মুসলিম উম্মাহ তাদের নিকট কৃতজ্ঞ। মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতদের জাগতিক উন্নতির কোন সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও এ শিক্ষা ব্যবস্থার টিকে থাকা বিস্ময়ের ব্যাপার। টিকে আছে এ কারণেই যে, যারা দুনিয়ার জীবনে উন্নতি করার বদলে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের মুক্তিকে জীবনের আসল লক্ষ্য স্থির করেছেন একমাত্র তারাই এ শিক্ষাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

যারা দুনিয়ার উন্নতিকেই চরম সাফল্য জ্ঞান করে তারা কি মাদ্রাসায় পড়ে? ধনীদের ছেলেরা কি মাদ্রাসায় যায়? সমাজের প্রতিভাবান ও মেধাবী ছেলেদের কয়জন মাদ্রাসায় ভর্তি হয়? গরীবের ঘরের মেধাবী ছেলেদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে আধুনিক শিক্ষা দেয়া হয় আর বিনা খরচে পড়ার সুযোগ পায় বলে গরীব বাপ-মা তাদের ঐ ছেলেকেই মাদ্রাসায় পাঠায় যে মেধাবী নয়। এ কারণেই খুব কম সংখ্যক মেধাবী ছেলেই মাদ্রাসা শিক্ষা গ্রহণ করে। আলিয়া নেসাবের মাদ্রাসায় দাখিল ও আলেম পরীক্ষায় যারা ভাল করে তারাও সাধারণ শিক্ষার উদ্দেশ্যে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে পড়ে। তাদের মধ্যে অল্প কিছু সংখ্যক ফাযেল ও কামেল পড়ার সাথে সাথে একই সংগে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নেবার কাংগালও হয়।

এ করুণ পরিস্থিতিতে আধুনিক যুগে সমাজ ব্যবস্থাকে ইসলামী ছাঁচে ঢেলে সাজাবার যোগ্য উন্নত মানের শিক্ষিত মানুষ প্রয়োজনীয় সংখ্যায় সৃষ্টি

www.amarboi.org

করতে সক্ষম হচ্ছে না বলে যারা মাদ্রাসা শিক্ষাকে গুরুত্ব দেন না তারা বড়ই অবিবেচক।

এ কথা মোটেই সঠিক নয় যে, ইসলামের এ বিপ্লবী ব্যাপক ব্যাখ্যা আলেমদের জানা নেই। আমাদের দেশে কিছু সংখ্যক এমন আলেম আছেন যারা ইসলামকে পূর্ণাংগ জীবন বিধান হিসাবে বুঝাবার যোগ্যতা রাখেন। বিশেষ করে মাদ্রাসা শিক্ষা লাভ করে যারা ইসলামী অন্দোলনে দায়িত্ব পালন করছেন তারা সবাই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসহ ইসলামের যথার্থ জ্ঞান রাখেন। তাদের মধ্যে বড় বড় এমন আলেমও আছেন যারা কুরআনের বিপ্লবী তাফসীরের মাধ্যমে জনগণকে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, তারা মাদ্রাসার পাঠ্যসূচী থেকে ইসলামকে এভাবে শেখার সুযোগ পাননি। কিন্তু আরবী ভাষা, কুরআনের তাফসীর এবং হাদীস ও ফিক্‌হ অধ্যয়নের মাধ্যমে মাদ্রাসায় যে জ্ঞান তারা আহরণ করেন তার ফলে ইসলামী আন্দোলনে শামিল হওয়ার পর অতি সহজে ও অল্প সময়েই তারা দ্বীনের ব্যাপক ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হন। আমাদের মতো আধুনিক শিক্ষতদের সে জ্ঞান হাসিল করতে দীর্ঘ সময় ও কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।

আমি ইসলামের যে ব্যাখ্যা পেশ করেছি তা আমার নিজস্ব আবিষ্কার নয়। আলেমগণের নিকট থেকেই এ ব্যাখ্যা আমি শিখেছি। সকল আলেমের মান কখনও এক হতে পারে না। যে আলেম দ্বীন সম্পর্কে যতটুকু বুঝতে পারেন সে মানেই তিনি ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন।

আধুনিক শিক্ষিতদের দায়িত্ব

আধুনিক শিক্ষা লাভ করে সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকারের সকল ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব নেতৃত্বের দায়িত্ব যারা পালন করেন, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা অধ্যাপনা করেন, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও আইনজীবী হিসাবে যারা সর্বোচ্চ শিক্ষার

www.amarboi.org

গৌরব লাভ করেছেন, শিল্প ও ব্যবসা–বাণিজ্যে যারা সম্পদশালী হয়েছেন তারাও তো নিজেদেরকে মুসলমান বলেই মনে করেন। ঈদের নামাযে তাদের সংখ্যাও তো বিরাট। তাদের মেধা, প্রতিভা, যোগ্যতা ইত্যাদি প্রয়োগ করে কুরআনকে আয়ত্ব করা ও ইসলামের উন্নত মানের শিক্ষা অর্জন করা এবং আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্রকে ইসলামী আদর্শে পরিচালনার যোগ্যতা অর্জন করার দায়িত্ববোধ থাকা প্রয়োজন। আলেম সমাজের উপর দোষ চাপিয়ে নিজেদের দোষ এড়ানো যাবে না।

আজ ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী আইন, ইসলামী অর্থনীতির কথা শুনলে যারা নাক সিটকান তারা পণ্ডিত–মূর্খ।* তারা অনেক বিষয়েই মহা পণ্ডিত হলেও ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ। তাদের মধ্যে এমন লোকও বেশ আছেন যারা অশিক্ষিত সাধারণ মুসলমানদের চেয়েও অধম। কারণ সাধারণ মুসলমানদের অন্তরে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, রসূলের প্রতি মহব্বত ও কুরআনের প্রতি যে ভক্তিটুকু আছে তা থেকেও তারা বঞ্চিত।

মুসলিমের প্রথম কর্তব্য

মুসলিম তাকেই বলে যে বুঝে শুনে কালেমায়ে তাইয়্যেবাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে। কালেমায়ে তাইয়্যেবায় দু'টো কথা মেনে নেয়া হয়।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"আল্লাহ চাড়া মাবূদ নেই, মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল।" এটুকু হলো শাব্দিক তরজমা। এর মর্মকথা হলো ঃ

১। আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে হুকুমকর্তা বা মনিব মানি না এবং তার হুকুমের বিপরীত কারো হুকুম মানব না।

---

* 'পণ্ডিত–মূর্খ' কথাটির প্রখ্যাত পণ্ডিত ও ইসলামী চিন্তাবিদ মরহুম ডঃ মুহাম্মাদ শহীদুল্লার মুখে ছাত্রজীবনেই শুনেছিলাম।

www.amarboi.org

২। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল হিসেবে যে সব হুকুম আল্লাহর কাছ থেকে পেয়েছেন তা তিনি যে তরীকা বা নিয়মে পালন করেছেন সেভাবেই আমি পালন করব এবং রাসূল (সাঃ)–এর শেখানো তরীকা ছাড়া আর কারো কাছ থেকে ভিন্ন রকম কোন তরীকা গ্রহণ করব না।

কালেমায়ে তাইয়্যেবার মাধ্যমে আসলে দুনিয়ায় জীবন যাপনের পলিসী বা নীতি ঘোষণা করা হয়। যে কালেমা কবুল করল সে প্রকৃতপক্ষে এ 'লাইফ–পলিসী' গ্রহণ করল যে, সে একমাত্র আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী জীবন যাপন করবে। কালেমা কোন এমন মন্ত্র নয় যে, তা উচ্চারণ করলেই সে আল্লাহর নিকট মুসলিম বলে গণ্য হবে। ঈমান মানে কালেমার শব্দ কয়টির উপর বিশ্বাস নয়, এর অর্থের উপর বিশ্বাস।

যে বুঝে শুনে এ কালেমাকে কবুল করে তার জীবন স্বাভাবিক ও সংগত কারণেই এক বিশেষ ধরনের হবে। যে এ কালেমা কবুল করেনি তার জীবন থেকে কালেমা কবুলকারীর জীবন ধারা অবশ্যই ভিন্ন হবে। সে কালেমার মাধ্যমে যে পলিসী গ্রহণ করেছে সে অনুযায়ী সে জীবনে সব কিছুই আল্লাহর হুকুম ও রাসূল (সাঃ)–এর তরীকা অনুযায়ীই করার চেষ্টা করবে। এ নিয়মে জীবন যাপনের যোগ্য হবার উদ্দেশ্যেই দিনে ৫ বার নামাযের মাধ্যমে তাকে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী চলবার অভ্যাস করান হয়। নামাযে রত থাকা অবস্থায় দেহ ও মনে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকার বাইরে কোন কিছু করা চলে না।

কালেমা কবুলকারীর ২৪ ঘন্টার রুটীন নামায দিয়ে শুরু হয়। ফজর নামাযের পূর্বে নামাযের প্রস্তুতিমূলক কাজ ছাড়া আর কোন কাজ দিয়ে দিনের সূচনা করা হয় না। নামাযে সকল অংগ–প্রত্যংগ ও মনকে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী চলার যে ট্রেনিং দেয়া হলো তা সংগে নিয়ে যোহরের পূর্ব পর্যন্ত সব কাজ ঐ নিয়মেই করতে চেষ্টা করা কর্তব্য। অংগ প্রত্যংগ যাতে আল্লাহর মরযী ও রাসূলের শিক্ষার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়ে না যায় সে বিষয়ে সতর্ক ও সচেতন থেকেই দুনিয়ার যাবতীয় কাজ–কর্ম

www.amarboi.org

চালিয়ে যেতে হবে। ইতিমধ্যে ফজরের ট্রেনিং ঢিলা হয়ে যেতে পারে নানা কারণে। তাই যোহরের নামাযে ঐ ট্রেনিংকে মযবুত করে নিতে হয়। এভাবেই আসর ও মাগরিবে কর্মবিরতি দিয়ে ট্রেনিংকে সজীব রাখতে হয়। দিনের রুটীন এভাবে নামায দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং রুটীনের শেষ কাজ এশার নামায। নামাযের এ চেতনা নিয়েই ঘুমাতে হবে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি এশার নামায জামায়াতে আদায় করে ঘুমিয়ে পড়ল এবং ফজরে আবার জামায়াতে হাযির হলো সে ব্যক্তি সারা রাত নামাযে রত ছিল বলেই তার আমলনামায় লেখা হবে।" এভাবে নামায ঘুমকেও ইবাদত বানিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য নামায জামায়াতে আদায় করারই নিয়ম। অবশ্য কোন কারণে জামায়াত না পেলে একাই আদায় করতে হবে।

নাফস বা প্রবৃত্তির তাড়নায় নামাযের শিক্ষাকে যথাযথভাবে বাস্তবে কাজে লাগাতে পারা যায় না বলেই রোযার মাধ্যমে নাফসকে কাবু করে নিয়ন্ত্রণে আনার ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে। এ কারণেই নামায ও রোযা শুধু ইবাদত নয়। বুনিয়াদী ইবাদত। অর্থাৎ নামায ও রোযা এমন ইবাদত যা দুনিয়ার যাবতীয় কাজকে ইবাদতে পরিণত করে।

ইবাদত শব্দটি আবৃদ থেকে গঠিত। আবদ মানে দাস; ইবাদত মানে দাসত্ব। মনিবের হুকুম পালন করাই ইবাদত। রমযান মাসে রোযা রাখা ইবাদত। আবার ঈদের দিনে রোযা ভাংগাই ইবাদত। কেননা, আল্লাহ সেদিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহর আদেশ যেমন হুকুম, নিষেধও তেমন হুকুম।

আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা মতো করা হলে মুসলমানের সব কাজই ইবাদতে পরিণত হয়। মুসলমানের দুনিয়াদারী কাজও দ্বীনদারী বলে গণ্য হয়। আল্লাহর রাসূল মানুষকে দুনিয়া ত্যাগ করতে বলেননি। বরং দুনিয়াদারীর যাবতীয় কাজকে দ্বীনদারীতে পরিণত করাই রাসূলের শিক্ষা।

www.amarboi.org

মুসলিমের দ্বিতীয় কর্তব্য

যে মুসলমান এভাবে কালেমায়ে তাইয়্যেবাকে বুঝে কবুল করেছে এবং আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার প্রধান দায়িত্ব হলো ইসলামের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা। সে যে কাজই করতে চায় তা করার আগে এ বিষয়ে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা কী তা জানবার ব্যবস্থা করবে এবং সে অনুযায়ীই ঐ কাজটি করার চেষ্টা করবে।

আয়ের ব্যাপারে হালাল-হারাম সম্পর্কে জ্ঞান, মুসলিম স্বামী ও স্ত্রী হিসাবে জীবন যাপনের রীতি-পদ্ধতি, সন্তান লালন-পালনে করণীয়, লেনদেনের ইসলামী বিধান ইত্যাদি সব ব্যাপারেই আল্লাহর বিধান ও রাসূলের সুন্নাত বা পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে হবে এবং তা মেনে চলতে হবে। যদি তা করা না হয় তাহলে এ সব ক্ষেত্রে মুসলিম হিসাবে জীবন যাপন করা সম্ভব হবে না। ফলে বাস্তবে কাফির ও মুশরিকদের মতোই জীবন পরিচালিত হবে।

অবশ্য এ কথা কঠিন সত্য যে, রাষ্ট্র ও সরকার ইসলাম অনুযায়ী পরিচালিত না হলে শত চেষ্টা সত্ত্বেও পুরোপুরি খাঁটি মুসলিম জীবন যাপন করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। আল্লাহ পাক মানুষের নিকট থেকে সাধ্যের অতিরিক্ত দাবী করেন না বলে জানিয়েছেন। তাই সাধ্য মতো চেষ্টা করে যেতে হবে যাতে মুসলিম হিসাবে কালেমার ওয়াদা অনুযায়ী জীবন যাপন করা যায়।

মুসলিমের তৃতীয় কর্তব্য

রাষ্ট্র, সরকার ও সমাজ যদি মুসলিম না হয় অর্থাৎ যদি আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালিত না হয় তাহলে কোন ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন ইসলামী আদর্শ সঠিক ও পূর্ণভাবে মেনে চলতে পারে

www.amarboi.org

না। এ কারণেই আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের জন্য সংগবদ্ধ প্রচেষ্টা চালানো সব ফরযের বড় ফরয যা আদায় করার জন্য আল্লাহ তায়ালা রাসূলকে পাঠিয়েছেন।

আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম করা এমন এক বিরাট কাজ যা নবীর পক্ষেও একা করা সম্ভব নয়। তাই নবী ও রাসূলগণ কালেমা কবুলকারীদেরকে সংগঠনভুক্ত করে সামষ্টিক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। রোজ ৫ ওয়াক্ত জামায়াতে নামায আদায়ের বিধান ঐ সাংগঠনিক শক্তি সংহত করে। এ কারণেই দ্বীন কায়েমের সবচেয়ে বড় ফরযটি আদায় করার উদ্দেশ্যে সংগঠিত হওয়া বা জামায়াতভুক্ত হওয়া দ্বিতীয় বড় ফরয।

রাষ্ট্র, সরকার ও সমাজ ব্যবস্থা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী গড়ে তুলবার কাজটি এত বিরাট ও ব্যাপক যে, অত্যন্ত সুসংগঠিত একদল সমাজ বিপ্লবী তৈরী করা ছাড়া এর সাফল্য অসম্ভব। সত্যিকার মুসলিম মানেই ইসলামী বিপ্লবের সৈনিক। কুরআনের ভাষায় বলা হয় মুজাহিদ।

জিহাদ শব্দ থেকে মুজাহিদ শব্দটি গঠিত। জুহ্দ মানে চেষ্টা। এ থেকেই জিহাদ মানে বিরোধী শক্তির মুকাবিলা করা সর্বাবস্থায় চেষ্টা চালু রাখা। সংগ্রাম শব্দটি জিহাদের সার্থক অনুবাদ বলে গণ্য হতে পারে। মুজাহিদ মানে সংগ্রামী। আল্লাহ যা পছন্দ করেন তা মানব সমাজে চালু করা এবং যা তিনি অপছন্দ করেন তা দূর করে সমাজকে পবিত্র করাই জিহাদের লক্ষ্য। তাই মুসলিম মানেই মুজাহিদ।

মুসলিম শাসকদের ৪– দফা কর্মসূচী

দেশ শাসন ও পরিচালনার দায়িত্ব যারা গ্রহণ করেন তারা যদি নিজেদেরকে মুসলিমই মনে করেন তাহলে শাসনের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা জানা তাদের উপর ফরয এবং সে অনুযায়ীই শাসন ও পরিচালনা করা কর্তব্য। যদি তা না করেন তাহলে তাদের মুসলিম হওয়ার

www.amarboi.org

দাবী অর্থহীন। কারণ তাদের ও অমুসলিমদের শাসনে কোন পার্থক্য থাকবে না। মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তারা অমুসলিমদের মতোই আচরণ করবেন।

আল্লাহ তায়ালা সূরা আল-হাজ্জের ৪১ নং আয়াতে মুসলিম শাসকদের ৪-দফা কর্মসূচী স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ

"(তারাই আল্লাহর সাহায্য পাবে) যাদেরকে যদি আমি পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করি তাহলে তারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করে, ভাল কাজের আদেশ করে এবং মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রখে।"

রাসূল (সাঃ) নিজে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন এবং তাঁর পদাংক অনুসরণ করে তাঁর ৪ জন খলীফা ইসলামী আদর্শের উজ্জ্বল উদাহরণ রেখে গেছেন। বিশেষ করে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর শাসনকাল পর্যন্ত যে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু ছিল তা সর্বদিক দিয়ে মানব জাতির জন্য অতি উন্নত মানের নমুনা বলে অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ পর্যন্ত অকপটে স্বীকার করেছেন।

দেশ শাসন ও মানব সমাজকে গড়ে তুলবার ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীসে যেসব হেদায়াত বা নির্দেশিকা রয়েছে এবং রাসূল(সাঃ) থেকে খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনকাল পর্যন্ত সরকার পরিচালনার যে ইতিহাস রয়েছে তার আলোকে উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখিত ৪-দফা কর্মসূচীর ব্যাখ্যা করা হলে সহজেই এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। এ উদ্দেশ্যেই ঐ ৪-দফার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পেশ করার চেষ্টা করছি।

কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী ঐ ৪-দফা কর্মসূচীর যে উদ্দেশ্য রয়েছে এর ভিত্তিতে দফাগুলোর নিম্নরূপ নামকরণ করা যায় ঃ

www.amarboi.org

১। চরিত্র গঠন করা।

২। ইনসাফপূর্ণ অর্থ–ব্যবস্থা কায়েম করা।

৩। কল্যাণমূলক কাজ চালু করা।

৪। অনিষ্টকর কাজ বন্ধ করা।

এখন এক একটি দফা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

প্রথম দফা ঃ
চরিত্র গঠন করা

মানুষের আসল সম্পদই হল চরিত্র। চরিত্রবান লোক সবারই প্রশংসার পাত্র। 'চরিত্র' কথাটি বিশ্বজনীন। কোন কালেই কোন মানব সমাজ চরিত্রের গুরুত্ব অস্বীকার করেনি। চরিত্রের উন্নতি ছাড়া কোন জাতিই বড় হতে পারেনি। শিক্ষা–ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্যই চরিত্র গঠন বলে সবাই স্বীকার করে।

চরিত্র মানে কী? বিবেকের নির্দেশ মেনে চললে যে আচরণ প্রকাশ পায় তারই নাম চরিত্র। চরিত্রের এর চেয়ে সহজ ও স্পষ্ট সংজ্ঞা আমার জানা নেই।

বিবেক কী? ভাল ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায়, সত্য ও মিথ্যা, সততা ও অসততা, কল্যাণ ও অকল্যাণ, ক্ষতিকর ও উপকারী, ঠিক ও বেঠিক ইত্যাদি ব্যাপারে মানুষের মধ্যে যে চেতনাবোধ রয়েছে এরই নাম বিবেক, এ অভিজ্ঞতা সব মানুষেরই আছে যে, খারাপ কাজ করলে বিবেক দংশন করে। কোন খারাপ কাজকেই বিবেক ভাল বলে স্বীকার করে না।

কুরআনের মতে মানুষের দেহটি আসল মানুষ নয়। দেহ অন্য সব পশুর মতোই পশু মাত্র। এর ভাল ও মন্দের কোন চেতনা নেই। দেহ নিছক বস্তুসত্তা। চুরি করে মিষ্টি খেলেও জিহবা মিষ্টতাই অনুভব করবে। কিন্তু তার

www.amarboi.org

বিবেকের নিকট তা তিক্ত মনে হবে। বিবেক বলবে যে, চুরি করে আনা মোটেই ঠিক হয়নি।

কুরআনের ভাষায় মানুষের বস্তুসত্তার উর্ধে যে সত্তা রয়েছে এর নাম রূহ। এটাই মানুষের আসল সত্তা। এটা পুরোপুরী নৈতিক সত্তা (Moral Existence)।এ রূহ আল্লাহর এক বিশেষ দান। আল্লাহ বলেন ঃ

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ۝

"যখন আমি (আদমের দেহ) তৈরীর কাজ সম্পন্ন করলাম তখন আমি আমার রূহ থেকে এর মধ্যে ফুঁ দিয়ে দিলাম। তখন (ফিরিশতারা) তাকে সিজদা করল।" (সূরা আল–হিজর ২৯ আয়াত ও সূরা সোয়াদ ৭২ আয়াত)

রূহই আসল মানুষ। মনুষ্যত্ব বললে রূহের গুণাবলীকেই বুঝায়। মানুষের সৎ গুণাবলীকেই মনুষ্যত্ব বলে। তাই জঘন্য চরিত্রের লোক সম্পর্কে বলা হয় "সে একেবারেই অমানুষ, তাকে মানুষ বলা চলে না।" অথচ দৈহিক দিক দিয়ে সে অত্যন্ত সুন্দর ও সুপুরুষ মনে হতে পারে।

বস্তুগত উপাদানে দেহ তৈরী বলেই বস্তু জগতের প্রতি এর তীব্র আকর্ষণ রয়েছে এবং জগতকে ভোগ করার জন্য দেহের দাবীর অন্ত নেই। যা পেলে দেহে তৃপ্তি বোধ হয় তা পাওয়ার অদম্য আগ্রহ রয়েছে। তা সদভাবে পাওয়া গেল না অন্যায় পথে এলো সে বিবেচনা করা দেহের কাজ নয়। দেহের এ সব দাবীকে কুরআনের পরিভাষায় নাফস বলা হয়। ভাল ও মন্দের পরওয়া না করে দেহ যেসব দাবী জানায় তা রূহের বিবেচনায় মন্দ হলে সে আপত্তি জানায়। এভাবে নাফস ও রূহের মধ্যে এক স্থায়ী সংঘর্ষ চলছে। সব মানুষই এ তিক্ত অভিজ্ঞতার সাক্ষী।

নাফস ও রূহের এ দ্বন্দ্বে নাফসের তিন রকম অবস্থা হয় বলে কুরআনে চমৎকার ব্যাখ্যা দেয়া আছে।

১। নাফসে আম্মারাহ (نفس امارة) আদেশ দাতা নাফস

اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ

www.amarboi.org

"নাফসের কাজই হলো মন্দের জন্য হুকুম করা।" (সূরা ইউসুফ ৫৩ আয়াত)

নাফসের এ অবস্থায় বুঝা গেল যে, রূহ বা বিবেক এত দুর্বল যে সে নাফসকে বাধা দেয়া বা নাফসের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলতেও অক্ষম। যার নাফস এ পর্যায়ের সে বিনা বাধায়, মন্দ কাজ করতেই থাকে। এর মধ্যে মনুষ্যত্বের লেশ মাত্র নেই।

২। নাফসে লাওয়ামাহ (نفس لوامة) ভর্ৎসিত বা তিরস্কৃত নাফস, যে রূহের নিকট ধমক খায়। অর্থাৎ রূহ এতটা শক্তি রাখে যে, সে আপত্তি জানায়। ফলে কোন সময় নাফস জয়ী হয়, কোন সময় রূহ নাফসকে ফিরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়।

لَآ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۝ وَلَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

"না তা নয়। আমি কসম খাচ্ছি নাফসে লাওয়ামার (বা বিবেকের)"

(সূরা আল-কিয়ামাহ ২ আয়াত)

৩। নাফসে মুতমাইন্নাহ (نفس مطمئن) প্রশান্ত নাফস। নাফসের এ পর্যায়ে রূহের সাথে এর দ্বন্দ্ব থাকে না। রূহ আপত্তি জানাতে পারে এমন দাবী করার সাহসই আর নাফসের পক্ষ থেকে হয় না। তখন নাফস রূহের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। আল্লাহ পাক এমন নাফসকেই সন্তুষ্ট হয়ে বেহেশতে প্রবেশ করার আহবান জানান ঃ

يٰاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِيْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ۝

"হে প্রশান্ত আত্মা, চল তোমার রবের দিকে এমন অবস্থায় যে, তুমি (নিজের ভাল পরিণামের কারণে) সন্তুষ্ট (আর তোমার রবের নিকট) পছন্দনীয়। তুমি আমার প্রিয় বান্দাহদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।" (সূরা আল-ফাজর ২৭-৩০ আয়াত)

নাফসের এ তিন অবস্থার মধ্যে যার নাফস প্রথম পর্যায়ে আছে সে চরম চরিত্রহীন বা জঘন্য চরিত্রের লোক। দ্বিতীয় পর্যায়ে চরিত্রের মান বিভিন্ন হয়ে

www.amarboi.org

থাকে। যে তার নাফসের উপর যত বেশী জয়ী হয় তার চরিত্র সে পরিমাণেই উন্নত হয়। আর শেষ পর্যায় হলো চরিত্রের উন্নততম মান এবং মনুষ্যত্বের পরম উৎকর্ষতা।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সত্যিকার মানুষ ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী বানাবার উদ্দেশ্যে রাসূলের মাধ্যমে যে বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন তা ঈমান দিয়েই শুরু হয়। একমাত্র আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা মতো চলবার সিদ্ধান্তের নামই ঈমান। আর এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলার যোগ্য হবার উদ্দেশ্যেই নামায ও রোযার মাধ্যমে মযবুত ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মুসলিম শাসকদের উপর জনগণের চরিত্র গঠনের যে পয়লা দফা কর্তব্য রয়েছে তার মূল ভিত্তিই হলো নামায। নামায সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ

"আমাকে স্মরণ রাখার উদ্দেশ্যে নামায কায়েম কর।"

(সূরা তোয়াহা ১৪ আয়াত)

মুসলিম জীবনের ২৪ ঘন্টার রুটীন নামায দিয়েই শুরু এবং নামায দিয়েই সমাপ্ত করতে হয় এবং সারা দিনের ব্যস্ততার ফাঁকে তিন বার আল্লাহর দরবারে হাযির হতে হয় যাতে আল্লাহকে ভুলে যাবার আশংকা না থাকে। নামায তাকে বারবার মনে করিয়ে দেয় যে, সে আল্লাহর দাস। তার নাফসের দাস নয়।

নামাযের সুফল সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ,

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ

"নিশ্চয়ই নামায অশ্লীলতা ও বিবেক-বিরোধী কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে।" (সূরা আল-আনকাবূত ৪৫ আয়াত)

যারা নামাযের মহান উদ্দেশ্য বুঝে না এবং শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসাবে একমাত্র সওয়াব হাসিলের নিয়তে নামায আদায় করে তার নামায

www.amarboi.org

তাকে মন্দ কাজ থেকে ফিরাবার ক্ষমতা রাখে না। এ জাতীয় নামায আল্লাহ কবুল করবেন কি না তিনিই জনেন। তিনি ঐ নামাযকেই নামায বলে গণ্য করেন যে নামায তাঁর অপছন্দনীয় কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে।

মুসলিম শাসকদের পয়লা কর্তব্যই হলো জনগণের চরিত্র উন্নত মানে গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে দেশে নামায ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে চালু করা, জমায়াতের সাথে ফরয নামায আদায়ের অভ্যাস গড়ে তোলা ও মসজিদকে সামাজিক কেন্দ্রে উন্নীত করার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা।

ফরয নামায একা একা আদায় করার বিধান দেয়া হয়নি। কোন ব্যক্তি যদি জামায়াতে নামায আদায়ের কোন প্রয়োজনই মনে না করে এবং একাই নামায আদায় করা যথেষ্ট মনে করে তাহলে এ নামায কবুল হবে কিনা সন্দেহ। আল্লাহ পাক কুরআনে যতবার নামাযের নির্দেশ দিয়েছেন প্রতিবারই বহুবচন ব্যবহার করেছেন ঃ اقيموا الصلوة "তোমরা সালাত কায়েম কর।"

আরও একটা কথা গুরুত্বপূর্ণ যে, আল্লাহ নামায পড় বলেননি, কায়েম করতে বলেছেন। মুসলিম শাসকগণ শুধু নিজেরা নামায পড়বে এমন নির্দেশ দেয়া হয়নি। বরং সমাজে নামায ব্যবস্থা চালু করা কর্তব্য বলেই ঘোষণা করেছেন।

দ্বিতীয় দফা ঃ
ইনসাফপূর্ণ অর্থ ব্যবস্থা কায়েম করা

মুসলিম শাসকদের দ্বিতীয় দফা কর্তব্য হলো এমন অর্থ–ব্যবস্থা চালু করা যা আল্লাহ তায়ালার রুবুবিয়াতের নীতির প্রতিনিধিত্ব করবে। আল্লাহ গোটা বিশ্বের প্রতিপালক বা রব। কুরআনের পয়লা যে আয়াতটি নাযিল হয় সেখানে তিনি রব হিসাবেই নিজের পরিচয় দিয়েছেন ঃ

www.amarboi.org

اِقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ

"পড় তোমার রবের নাম নিয়ে যিনি পয়দা করেছেন।"

(সূরা আল–আলাক ১ম আয়াত)

প্রথম পূর্ণ সূরা হিসাবে নাযিলকৃত সূরা আল–ফাতিহার পয়লা আয়াতেও তিনি রব হিসাবেই নিজকে প্রকাশ করেছেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

"প্রশংসা শুধু আল্লাহরই জন্য যিনি সারা জাহানের রব।"

নামাযে রুকূ এবং সিজদায় তাসবীহ পড়ার যে বিধান দেয়া হয়েছে সেখানেও একমাত্র রব হিসাবেই উল্লেখ করতে বলা হয়েছে।

আল্লাহ পাক তার বান্দাহদেরকে তার কাছে চাওয়ার জন্য বহু দোয়া কুরআনে শিক্ষা দিয়েছেন। ঐ সব দোয়ার কোথাও 'আল্লাহুম্মা' (হে আল্লাহ) দিয়ে শুরু করা হয়নি। সবখানেই 'রাব্বি' (আমার রব) বা 'রাব্বানা' (আমাদের রব) দিয়ে শুরু করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ এটাই পছন্দ করেন যে, তাঁর বান্দাহরা তাঁকে 'রব' বলেই সম্বোধন করুক। এটা সত্যিই অত্যন্ত গভীর তাৎপর্য বহন করে।

আল্লাহ তায়ালা বিশ্বের রব— এ কথার অর্থ বড়ই ব্যাপক। সকল সৃষ্টির যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা তিনিই করেন। তাঁর এ কাজটি হলো 'রুবুবিয়াত' বা প্রতিপালন। তিনি এ কাজটি সরাসরি করে থাকেন। সকল প্রাণীই এ রুবুবিয়াতের সুফল উপভোগ করছে। পশু, পক্ষী, কীট–পতংগ ইত্যাদির জন্য মানব জাতির মতো কোন সরকার কায়েম নেই। তাই সরকারী কর্তাদের শোষণ ও অবিচারের আশংকাও নেই। সবাই আল্লাহর রুবুবিয়াতের আওতায় যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের সুযোগ পাচ্ছে।

কিন্তু মানব জাতির ব্যাপারে ঐ ব্যবস্থার পরিবর্তে ভিন্ন বিধান দেয়া হয়েছে। মানব জাতির রব ত ঐ একই আল্লাহ। সবার প্রয়োজন পূরণের জন্য সৃষ্টির দিক দিয়ে রুবুবিয়াতের দায়িত্ব তিনি সরাসরিই পালন করে থাকেন।

www.amarboi.org

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ (القمر : ٤٩)

"আমি প্রত্যেক জিনিষ নির্দিষ্ট পরিমাপেই পয়দা করেছি।"

আল্লাহর সৃষ্টি থেকে মানুষের প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে উৎপাদন ব্যবস্থা ও বন্টন পদ্ধতির মূলনীতি রাসূল (সাঃ)–এর মাধ্যমে মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয় রাসূল (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীন আল্লাহর দেয়া মূলনীতির ভিত্তিতে আল্লাহর খলীফা হিসাবে তাঁর রুবুবিয়াতের দায়িত্ব পালন করে বাস্তব নমুনা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।

আল্লাহর দেয়া অর্থনীতির মূলনীতি ঃ

সম্পদের আসল ও স্থায়ী মালিক আল্লাহ তায়ালা। তিনি মানুষকে এ সম্পদ ব্যবহারের যে নীতিমালা দিয়েছেন তাতে এ কথা সুস্পষ্ট যে, সম্পদে মানুষের মালিকানা অস্থায়ী ও শর্তাধীন।

যাকাত ফরয করে আল্লাহ তায়ালা সম্পদে আল্লাহর স্থায়ী মালিকানা ও মানুষের শর্তাধীন মালিকানার স্বীকৃতি প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। যাকাত হালাল মাল থেকেই শুধু আল্লাহ কবুল করেন বলে যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম ও রাসূল (সাঃ)–এর তরীকা অনুযায়ী চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে একমাত্র হালাল উপায়েই সম্পদ অর্জন করে।

মানুষ সম্পদের নিরংকূশ মালিক নয় বলেই যেভাবে খুশী যেখান থেকে ইচ্ছা হালাল হারামের যাচাই না করে সম্পদ আহরণের অধিকার আল্লাহ দেননি। এ নীতি মেনে চলার ভিত্তি হলো যাকাত। এ নীতি যে মানে না সে তার সম্পদের একাংশ তার ভোগের বাইরে যাকাত বাবদ দেবে কেন?

ইসলামী অর্থনীতির মূল পরিচয়ই হলো যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি। ইসলামী সরকার এ অর্থনীতি কায়েম করতে সংগত কারণেই আয় ও ব্যয়ের ব্যাপারে হালাল ও হারামের সীমা বেঁধে দেয়।

যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি ইসলামী সরকারকে সম্পদশালীদের নিকট থেকে যাকাত উসূল করে যাদের হক আল্লাহ নির্ধারিত করে দিয়েছেন তাদের

www.amarboi.org

নিকট পৌঁছাবার দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেয়। এটাই সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা ছাড়া কোন রাষ্ট্র কল্যাণ রাষ্ট্র বলে গণ্য হতে পারে না।

আল্লাহর মালিকানার স্বীকৃতির মানে হলো সম্পদের আয়, ব্যয়, ভোগ, বিলি ইত্যাদি মনগড়াভাবে করার অধিকার মানুষের নেই। সব ব্যাপারেই আল্লাহর দেয়া নির্দেশ, তাকীদ ও হেদায়াত মেনে চলতে হবে। মুসলিম শাসকদের উপর এ দায়িত্বই দেয়া হয়েছে যাতে যাকাত ভিত্তিক ইসলামী অর্থনীতি কায়েম করে।

মানুষের মতো বেঁচে থাকার জন্য জীবনের নিরাপত্তা, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি এমন মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন যার ব্যবস্থা না করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আরোপিত রুবুবিয়াতের দায়িত্ব পালন হয় না।

এ সবের সুব্যবস্থা করার প্রয়োজনেই তো মানব সমাজে শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে হয়। যেসব শাসক এ দায়িত্ব যথাযথ পালন করে না তাদেরকে কুরআনে কাফির, যালিম ও ফাসেক আখ্যা দিয়েছে।

পুঁজিবাদের শোষণমূলক ব্যবস্থা উৎখাত করে শোষণমুক্ত অর্থনীতির শ্লোগান দিয়েই সমাজতন্ত্র কায়েম করা হয়। এখন এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক মুক্তির নামে রাজনৈতিক দাসত্ব ও অর্থনৈতিক পংগুত্বই দান করতে পারে। আর পুঁজিবাদের কথা তো বলাই বাহুল্য। পুঁজিবাদীরাও এ কলংকের উপাধি গ্রহণ করতে রাযী নয় এবং কেউ পুঁজিবাদকে কোন আদর্শ পদবাচ্য বলে স্বীকার করে না। তাই পুঁজিবাদের নাম বদল করে "বাজার অর্থনীতি" নাম রাখা হয়েছে।

প্রকৃত সত্য এটাই যে, ইসলামী অর্থনীতি ছাড়া মানব রচিত কোন অর্থব্যবস্থা দ্বারাই ইনসাফপূর্ণ ও শোষণমুক্ত সমজ ব্যবস্থা গড়া কিছুতেই সম্ভব নয়। উৎপাদন ও বন্টন এবং আয় ও ব্যয় সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহতে হালাল ও হারামের যে বিধি বিধান দেয়া হয়েছে তা বাস্তবে চালু করা হলে পরিপূর্ণ ইনসাফ ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা কায়েম হওয়াই স্বাভাবিক।

www.amarboi.org

তৃতীয় দফা ঃ
জনকল্যাণমূলক কাজ চালু করা

মুসলিম শাসকদের তৃতীয় কর্তব্য হলো যা কিছু মানুষের জন্য কল্যাণকর তা সরকারী প্রচেষ্টায় চালু করা। কুরআন পাকে কল্যাণকর কার্যাবলীকে مَعْرُوْفٌ মারূফ বলা হয়েছে عَرَفَ শব্দ থেকে মারূফ শব্দটি গঠিত। عَرَفَ মানে জানা। এ থেকেই তা'রীফ মানে পরিচয়, সংজ্ঞা এবং মারূফ মানে পরিচিত বা যা জানা আছে।

কুরআনে ভাল কাজ বুঝাবার জন্য মারূফ শব্দ ব্যবহার করার গভীর তাৎপর্য রয়েছে। মানুষকে ভাল ও মন্দের যে চেতনা দেয়া হয়েছে তার ফলে কোন্‌টা ভাল তা মানুষের নিকট অত্যন্ত পরিচিত। বিবেক যেসব কাজের পক্ষে মত দেয় তা–ই মারূফ। সত্য বলা যে সত্যি ভাল তা মিথ্যুকের নিকটও পরিচিত।

যেসব কাজ দেশ, জাতি ও সমাজের জন্য সত্যিই কল্যাণকর তা সরকারী উদ্যোগ, প্রচেষ্টা ও তদারকীতে চালু করার এ দায়িত্ব বড়ই ব্যাপক। অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা, উৎসাহ ও সহযোগিতা পেলে সমাজে ব্যাপকভাবে চালু হতে পারে।

কুরআন ও হাদীসে কল্যাণমূলক কাজের জন্য اَلْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ বা "ভাল কাজের আদেশ" পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। আদেশের পেছনে শক্তি বা 'অথরিটি' থাকে। কারণ ক্ষমতা প্রয়োগের যোগ্যতা না থাকলে আদেশ দেয়া যায় না। আর আদেশ দেয়া মানে কাজটি হতে হবে। যে আদেশ দেয় সে চায় যে, তার আদেশ মান্য করা হোক এবং যে কাজের আদেশ দেয়া হলো তা করা হোক।

www.amarboi.org

আদেশ আর উপদেশ এক কথা নয়। ভাল কাজের উপদেশ, ওয়ায ও নসীহত তারাই দেন যাদের আদেশ করার ক্ষমতা নেই বা যারা আদেশ করলেই কাজটি হয়ে যাবে না। আদেশ করা তার পক্ষেই সাজে যে প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করে কাজটি আদায় করে নিতে পারে এবং আদেশ অমান্য করলে শাস্তি দেবার ক্ষমতা রাখে।

ইসলামী রাষ্ট্রের উপর আল্লাহ তায়ালা দায়িত্ব দিয়েছেন যে, যা কিছু কল্যাণকর তা জনগণের মধ্যে চালু করার জন্য আদেশের হাতিয়ার ব্যবহার করবে। সরকারের পক্ষ থেকে শুধু উপদেশ দান করা যথেষ্ট নয়। উপদেশে কাজ না হলে আদেশ দিয়েই কাজ আদায় করতে হবে। আধুনিক যুগে কল্যাণ রাষ্ট্রের যে ধারণা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তা ইসলাম বহু শতাব্দী পূর্বেই প্রয়োগ করেছে।

শ' দেড়'শ বছর আগেও আইন-শৃংখলা বজায় রাখার পুলিশী দায়িত্বই শুধু রাষ্ট্রের হাতে থাকা উচিত বলে রাজনৈতিক মতবাদ চালু ছিল। ইতিবাচক কোন কাজের দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে থাকা ব্যক্তি স্বাধীনতার বিরোধী বলে গণ্য হতো, অধুনা কল্যাণ রাষ্ট্রের (Welfare state) ধারণা ব্যাপক সমর্থন লাভ করায় ইতিবাচক কার্যক্রম দ্রুত বেড়ে চলেছে।

ইসলামী পরিভাষায় اَلْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْى عَنِ الْمُنْكَرْ "ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ" কথাটি কুরআন ও হাদীসে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। শুধু সরকারী পর্যায়েই নয় বেসরকারী পর্যায়েও পরিবারে, সমাজে, প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বশীলদের উপর এ কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যার যেখানে যতটুকু কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব ও প্রাধান্য রয়েছে তা প্রয়োগ করে ভাল কাজের আদেশ করা ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করার দায়িত্ব পালনের উপর ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে।

www.amarboi.org

চতুর্থ দফা ঃ
অনিষ্টকর কাজ বন্ধ করা

মুসলিম শাসকদের চতুর্থ দফা কর্তব্য হলো ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ, জাতি ও পরিবেশের জন্য অনিষ্টকর যাবতীয় কার্যকলাপ থেকে জনগণকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সরকারীভাবে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে অনিষ্টতার উৎসমূল পর্যন্ত উৎপাটন করার ব্যবস্থা করা। এ বিরাট গুরুত্বপূর্ণ কাজটির জন্য কুরআন ও হাদীসে যে পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা বড়ই তৎপর্যপূর্ণ। এর নাম দেয়া রয়েছে। اَلنَّهِى عَنِ الْمُنْكَرِ বা মুনকার থেকে নিষেধ করা। نهى শব্দের অর্থ নিষেধ, Prohibit, prevent, forbid ইত্যাদি। আর শব্দটি انكار থেকে গঠিত। ইনকার মানে অস্বীকার Denial । আর মুনকার মানে অস্বীকৃত যাকে অস্বীকার করা হয়েছে Denied, unacknowledged এ সব শাব্দিক অর্থ অভিধানেই আছে।

মুনকার শব্দের অর্থ করা হয় মন্দ, নিষিদ্ধ ও অনিষ্টকর কাজ। এগুলো এর আভিধানিক অর্থ নয় পারিভাষিক অর্থ। অনিষ্টকর কাজের জন্য মুনকার শব্দের ব্যবহার চমৎকার তাৎপর্য বহন করে। আল্লাহ পাক মন্দ কাজ বুঝাবার জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করে মানুষের বিবেককে নাড়া দিয়েছেন। অর্থাৎ হে মানুষ তোমাদের বিবেক যেসব বিষয়কে ভাল বলে স্বীকার করে না। যেসব কাজকে সমর্থন করতে অস্বীকার করে তা থেকেই তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। তোমাদের বিবেকের বিরুদ্ধে না চলার জন্যই বলা হয়েছে। যেসব থেকে তোমাদেরকে ফিরে থাকতে বা দূরে থাকতে বলা হয়েছে এর কোনটাই তোমাদের বিবেক ভাল বলে স্বীকার করে না।

আদেশ দাতা যেমন ক্ষমতার অধিকারী, নিষেধকারীও তেমনি। অথরিটি ছাড়া নিষেধ করা সাজে না। আবার অথরিটি যার আছে তার পক্ষে অনুরোধ

www.amarboi.org

করাও স্বাভাবিক নয়। যারা ওয়ায করেন তারা মন্দ কাজ থেকে ফিরে থাকার জন্য উপদেশ বা পরামর্শ দেন, অথবা অনুরোধ জানান। কারণ তাদের নিষেধ করার সাধ্য নেই। নিষেধ সে-ই করতে পারে যে তা অমান্য করলে শাস্তি দেবার ক্ষমতা রাখে।

"নাহী আনিল মুনকার" বা অনিষ্টকর কাজ থেকে নিষেধ করার কর্তব্যটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। শাসকগণ এ কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করলে সমাজের জন্য ক্ষতিকর কোন কাজই অবাধে, প্রকাশ্যে ও ব্যাপক পরিমাণে চালু থাকতে পারে না। আরও স্পষ্ট ভাষায় বলতে হয় যে, যাবতীয় মুনকার শাসকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থনেই চালু থাকে।

আমাদের দেশে বর্তামানে সন্ত্রাস যে চরম আকার ধারণ করেছে তা গত ২০ বছরে শাসকদের মাধ্যমেই চালু হয়েছে। বর্তমান সরকার দেশের প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের বাড়ীতে যেসব লাইসেন্স বিহীন অস্ত্রের কারণে তাকে কারাদণ্ড দিতে সক্ষম হয়েছেন তারা ছাত্রদের হাতে এর চেয়েও বেশী মারাত্মক অস্ত্র, রাজধানীতেই অবাধে ব্যবহার করতে বাধা দিতে অক্ষম হতে পারেন না। তাদের সমর্থক ছাত্রদেরকে তারা নিরস্ত্র করতে চান না বলেই শুধু সরকার বিরোধীদের উপরই হাত দিতে পারছেন না। প্রশাসন ও পুলিশকে সন্ত্রাস দমনে পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে দিলে সন্ত্রাস দমন হতে বাধ্য।

বর্তমানে সরকারী দল ও প্রধান বিরোধী দল তাদের ছাত্র ও যুব-পেশী-শক্তির উপর নির্ভরশীলতা পরিত্যাগ করলে অবিলম্বে সন্ত্রাস বন্ধ হয়ে যাবে। গণতন্ত্র এখনও মুখের বুলি মাত্র, এর অনুশীলন একেবারেই অনুপস্থিত। দলের সাংগঠনিক প্রক্রিয়াতেও পেশী শক্তির প্রাধান্য সুস্পষ্ট।

যুবতী-কিশোরী অপহরণ, ধর্ষণ, হত্যার ব্যাপকতায় সবাই পেরেশান। অথচ সিনেমা, ভি.সি.আর এবং সংস্কৃতির নামে অশ্লীল নৃত্য তরুণ ও যুব সমাজের চরিত্র ধ্বংস করছে দেখেও সরকারের পক্ষ থেকে সামান্য বাধাও দেয়া হচ্ছে না। প্রশাসনের অশ্লীলতা বন্ধ করার নিয়ত থাকলে দিন দিন এ সব এভাবে বৃদ্ধি পেতে পারত না।

www.amarboi.org

ঘুষ, দুর্নীতি, অবৈধ সম্পদ অর্জন ও শোষণ থেকে জনগণকে রক্ষা করার দায়িত্ব যে শাসকদের উপর রয়েছে তারাই সরাসরি এ সব চালু করেছে। এ সব নীচ থেকে শুরু হয়নি। উপর থেকেই নাযিল হয়েছে।

উদাহরণের সংখ্যা বৃদ্ধি না করে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, 'মুনকার' পদবাচ্য সবই শাসকদের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সমর্থন ও অনুমোদন ছাড়া সমাজে ব্যাপকতা লাভ করতে পারে না। অনিষ্টকর সব কিছু বন্ধ করা শাসকদেরই দায়িত্ব। তাই আল্লাহ মুসলিম শাসকদের প্রধান ৪টি কর্তব্যের মধ্যে এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি শামিল করেছেন।

মুসলিম শাসকদের ৪-দফা কর্তব্যের শেষ দু'টো দফা মানব সমাজের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ যে, আল্লাহ তায়ালা গোটা মানব জাতির মধ্যে এ দু'টো কাজ চালু করা মুসলিম জাতির দায়িত্ব বলে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (ال عمران : ١١٠)

"(হে মুসলিম উম্মত) তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত। তোমাদেরকে মানব জাতির জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমাদের দায়িত্ব হলো যা কল্যাণকর তারদিকে আদেশ করা ও যা অনিষ্টকর তা বন্ধ করা।"

যেখানে গোটা বিশ্বেই মারূফ চালু করা ও মুনকার বন্ধ করা মুসলিম জাতির কর্তব্য, সেখানে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশেও মুসলিম নামধারী শাসকগণ এ কর্তব্য যথাযথ পালন করছে না। এর আসল কারণ শাসকদের মন, মগজ ও চরিত্র ইসলাম অনুযায়ী গঠিত নয়। এ কারণে রাসূল (সাঃ) তের বছর পর্যন্ত এমন একদল লোক তৈরী করলেন যাদেরকে নিয়ে মদীনায় ইসলামী সরকার গঠন করে ঐ ৪-দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হলেন।

www.amarboi.org

সব রাসূলের একই দায়িত্ব

সূরা আল–হাদীদের ২৫ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কী মহান উদ্দেশ্যে যুগে যুগে রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন তা অতি স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ ۝

"আমি আমার রাসূলগণকে স্পষ্ট প্রমাণাদি সহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও মীযান নাযিল করেছি যেন মানুষ ইনসাফের উপর কায়েম হতে পারে। আমি লোহাও (রাষ্ট্রশক্তি) নাযিল করেছি যার মধ্যে বিরাট শক্তি ও মানুষের জন্য বহু কণ্যাণ রয়েছে এটা এ উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে যাতে আল্লাহ জেনে নিতে পারেন যে, কে তাঁকে না দেখেও তাঁর ও তাঁর রাসূলগণের সাহায্য -সহযোগিতা করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই শক্তিমান ও প্রতাপশালী।"

সূরা হাদীসের ২৫ নং আয়াতটি বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। রাসূলগণকে দুনিয়ায় পাঠাবার আসল উদ্দেশ্য কি বরং ঐ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য রাসূলগণকে কী কী উপকরণ দান করা হয়েছে তা এখানে সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে যা সারা কুরআনের আর কোথাও এক আয়াতে এতটা স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না।

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন যে, তিনি যত রাসূল দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তাদের সবাইকে তিনটি উপকরণ দান করেছেন ঃ

www.amarboi.org

১। 'বাইয়েনাত' বা সুস্পষ্ট প্রমাণ বা নিদর্শন। অর্থাৎ যাদেরকে রাসূল নিয়োগ করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে এমন কতক গুণাবলী দেয়া হয়েছে যা এ কথার স্পষ্ট পরিচয় বহন করে যে, তাঁরা আল্লাহর রাসূল। নবুওয়াত প্রকাশ করার আগেই উন্নত মানবিক গুণের জন্য সবাই তাদেরকে প্রশংসা করতে বাধ্য হয়। সমাজে সব মানুষের মধ্যে যেসব দোষ–ত্রুটি থাকে তা তাঁদের মধ্যে না থাকায় তাদের মহান ব্যক্তিত্বের প্রভাব জনগণের মনে তাদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা পয়দা করে।

তাছাড়া রাসূলগণকে এমন সব মুজিযা দান করা হয়েছে যা তাদেরকে আল্লাহর রাসূল হিসাবে সহজে চিনে নিতে জনগণকে সাহায্য করে। যাতে মানুষ বুঝে নেয় যে, এ সব ব্যক্তির পেছনে আল্লাহর শক্তিশালী হাত রয়েছে।

২। কিতাব। আল্লাহ্ পাক মানুষের জীবনকে দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির পথে চালাবার জন্য অহীর মাধ্যমে কিতাব নাযিল করেছেন যার শেষ সংস্করণ হলো কুরআন।

৩। মীযান। এর শাব্দিক অর্থ হলো দাঁড়িপাল্লা বা তুলাদণ্ড। দাঁড়িপাল্লা ইনসাফ ও সুবিচারের প্রতীক। রাসূলগণকে মীযান দেয়ার অর্থ হলো চিন্তা ও কর্মের এমন ভারসাম্য বজায় রাখার যোগ্যতা যা তাদেরকে যে কোন বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। যে সঠিক জ্ঞান মানুষকে কোন চরমপন্থী হওয়া থেকে রক্ষা করে তাকেই মীযান বলা হয়েছে। দাঁড়িপাল্লার একদিক ঝুঁকে থাকলে বুঝা গেল যে, হয় মাপে কম দেয়া হচ্ছে অথবা বেশী নেয়া হচ্ছে। এটা ইনসাফের বিরোধী।

জীবনের সব অবস্থায়ই মানুষ চিন্তা, কথা, আচরণ, লেনদেন, পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদির ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান বা বিশুদ্ধ নিয়তের অভাবে ভারসাম্যতা বজায় রাখতে পারে না। ফলে তারা সঠিক পথে না চলে কোন এক দিকে ঝুঁকে পড়ে চরমপন্থী হয় এবং দুনিয়াতেও অশান্তি ভোগ করে, আখিরাতেও শাস্তির ভাগী হয়।

মানুষকে এ দুরবস্থা থেকে রক্ষা করার জন্যই রাসূলকে মানদণ্ড বা মেইয়ারে হক বানান হয়েছে যাতে হক ও বাতিল, ভাল ও মন্দ, সঠিক ও

www.amarboi.org

বেঠিকের মধ্যে দাঁড়িপাল্লার মতো ওজন করে মানুষকে শান্তির পথ দেখাতে পারেন।

এভাবে প্রত্যেক রাসূলকে বাইয়েনাত, কিতাব ও মীযান দিয়ে পাঠাবার আসল উদ্দেশ্য কী তা "লি-ইয়াকূমান্নাসু বিল কিসত" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ যাতে ইনসাফের উপর কায়েম হতে পারে। ইনসাফ এমন এক পরিভাষা যা ইংরেজী 'জাষ্টিস' ও বাংলা 'সুবিচার' শব্দ দ্বারা মোটামুটি বুঝানো যায়।

আসলে মানব সমাজের যাবতীয় অশান্তি ও বিশৃংখলার মূল কারণই হলো ইনসাফের অভাব। সবাই যার যার হক বা অধিকার যদি ঠিকমতো পায় তাহলেই বুঝা গেল যে, ইনসাফ কায়েম হয়েছে। এ ইনসাফের অভাবেই ব্যক্তি জীবন এবং পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চরম অশান্তি বিরাজ করছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এত উন্নতি সত্ত্বেও কোথাও ইনসাফ কায়েম নেই। এর কারণ এটাই যে, আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের মীযান ছাড়া ইনসাফ কায়েম হতে পারে না। তাই রাসূলকে ইনসাফ কায়েমের দায়িত্ব দিয়েই পাঠানো হয়েছে। রাসূলকে শুধু ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব দিয়ে পাঠানো হয়নি। তাই মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েম করার বিরাট দায়িত্ব রাসূল (সঃ) পালন করে গেছেন।

এরপর এ আয়াতে লোহা নাযিল করার কথা বলে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। কিতাব ও মীযান নাযিল করা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। লোহা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় ধাতু। আধুনিক জগত লোহা ছাড়া অচল। কিন্তু এ আয়াতে রাসূল পাঠাবার সাথে কিতাব ও মীযান নাযিল করার প্রসংগে 'লোহা' নামক ধাতুর উল্লেখ করাটা প্রাসংগিক হয় কেমন করে?

সকল বিখ্যাত তাফসীরে এর যত রকম ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তার মর্ম একই দাঁড়ায়। কেউ লোহা দ্বারা সামরিক শক্তি বুঝেছেন। কারণ সামরিক অস্ত্র

www.amarboi.org

শস্ত্র লোহা দিয়ে তৈরী হয়। কেউ রাষ্ট্রশক্তি বুঝেছেন। কারণ সামরিক অস্ত্র রাষ্ট্রের মরযীতেই ব্যবহার করা হয়। আবার কেউ লোহা দ্বারা সরকার বা শাসন শক্তি বুঝেছেন। কারণ সরকার যে শক্তি প্রয়োগ করে তাতে লোহার সরঞ্জামই ব্যবহার করতে হয়। সুতরাং এখানে লোহা শক্তির প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

এখানে এ প্রসংগ খুবই যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ পাক বাইয়েনাত, কিতাব ও মীযান দিয়ে মানব সমাজে ইনসাফ কায়েমের যে বিরাট দায়িত্ব রাসূলের উপর অর্পণ করেছেন তা শুধু ওয়ায, তাবলীগ ও তালকীনের দ্বারাই পালন করা সম্ভব নয়। আল্লাহর আইন সমাজে চালু করার জন্য শাসন ক্ষমতাও রাসূলের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন। তাই এ ক্ষমতাও রাসূল (সাঃ)–কে কাজে লাগাতে হয়েছে।

এ আয়াতে লোহা বা রাজশক্তির বৈশিষ্ট সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "এর মধ্যে বিরাট শক্তি ও মানুষের জন্য বহু কল্যাণ রয়েছে।" শাসনক্ষমতা এমন এক হাতিয়ার যা মানুষের উপর অন্যায়ভাবে শক্তি প্রয়োগ করতে পারে, আবার মানব সমাজের সার্বিক কল্যাণও সাধন করতে পারে 'বা'স' শব্দ দ্বারা বিপদও বুঝায়। অর্থাৎ সরকারী ক্ষমতা জনগণের জন্য বিপদের কারণও হতে পারে, আবার জনগণের খেদমতের বাহনও হতে পারে।

মানব জাতির ইতিহাস এ কথার সাক্ষী যে, রাষ্ট্র ক্ষমতা যদি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের মীযান অনুযায়ী ব্যবহার করা না হয় তাহলে জনজীবন দুঃখময় হতে বাধ্য। দুনিয়ার সবার সামনে এ সত্য আজ সুস্পষ্ট। মানুষ যদি ইনসাফ পেতে চায় তাহলে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন ছাড়া তা পাওয়া কখনও সম্ভব হবে না।

আয়াতের শেষাংশও বড়ই অর্থপূর্ণ। মানব সমাজে ইনসাফ কায়েমের জন্য আল্লাহ তায়ালা যে নিয়ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন সেদিকেই এখানে ইংগিত করা হয়েছে। আল্লাহ পাক সৃষ্টি জগতের সকল বস্তুর জন্যই আইন ও বিধান তৈরী করেছেন এবং তা নিজেই জারী করেছেন। কিন্তু মানব জাতির উপযোগী

www.amarboi.org

যে বিধান তিনি কিতাব আকারে রাসূলের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন তা চালু করার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করেছেন।

সে ব্যবস্থা হলো এই যে, তিনি রাসূলের উপর কিতাব ও মীযান নাযিল করেন এবং রাসূলের নেতৃত্বে একদল সৎ লোক তৈরী করার নির্দেশ দেন। রাসূল সকল বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকেন এবং আল্লাহর আইন জারী করার যোগ্য একদল সৎ লোক যোগাড় হলে রাসূলকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেন যাতে মানুষ ইনসাফ পায়। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের মীযান অনুযায়ী জীবন যাপনের সুযোগ পায়।

আল্লাহ নিজে তাঁর আইন জারী করার ব্যবস্থা না করে তাঁর বান্দাহদের মাধ্যমে ইনসাফ কায়েমের ঐ কঠিন পদ্ধতি কেন দিলেন সে কথাই এখানে বুঝানো হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো মানুষকে পরীক্ষার সুযোগ দান করা। যারা পরীক্ষায় পাশ করবে তাদেরকে তিনি পুরস্কার দেবেন। আর যারা ফেল করবে তাদেরকে শাস্তি দেবেন। এ পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ্ দেখে নিতে চান যে, আল্লাহ্কে না দেখে এবং আল্লাহ্র কথা মতো একজন মানুষকে রাসূল বলে স্বীকার করে কারা ইনসাফ কায়েমের সংগ্রামে শরীক হয়।

এ সংগ্রামকেই কুরআনে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ বা ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলন বলা হয়েছে। যারা এ দায়িত্ব পালন করে আল্লাহ পাক তাদেরকে তাঁর ও রাসূলের সাহায্যকারী বা আনসারুল্লাহ বলে গণ্য করেন। আনসারুল্লাহ্র এ বিরাট মর্যাদা কারা পেতে চায় তাদেরকে চিহ্নিত করাই এ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। তা না হলে শক্তিমান আল্লাহ্ কারো সাহায্যের কাংগাল নন।

এ ব্যবস্থা না করে যদি আল্লাহ নিজেই তাঁর কিতাব আপন শক্তিবলে কায়েম করে দিতেন তাহলে আনসারুল্লাহ্র মর্যাদা যারা পেতে চায় তাদের সে সুযোগ হতো না। মানুষকে তিনি চন্দ্র–সূর্য–গ্রহ–তারার মতো তাঁর আইন মানতে বাধ্য করেননি। বাধ্য করলে মানুষ আল্লাহ্র খলীফা হবার সৌভাগ্য লাভ করতে পারতো না।

www.amarboi.org

শেষ কথা

কুরআন মজীদে এ সব আয়াত এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যেসব আয়াত রয়েছে এ সম্পর্কে যারা জ্ঞান রাখেন তারা কিছুতেই ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদা করার মতবাদকে সমর্থন করতে পারেন না। যারা এ মতবাদ সমর্থন করেন তারা কুরআন অধ্যয়ন করেন না বলেই এমন মত পোষণ করেন। কুরআন আল্লাহর কিতাব এবং তা মেনে চলাই কর্তব্য বলে যারা মনে করে না তারাই এ মতবাদের ধারক ও সমর্থক হতে পারে।

এটা বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, মুসলিম হবার দাবীদার ব্যক্তি এমন কুরআন বিরোধী মত কেমন করে পোষণ করে। আরও বিস্ময়ের বিষয় যে, নিয়মিত নামায আদায় করা ও কুরআন তিলাওয়াত করায় অভ্যস্ত নেতা-নেত্রীরাও এ মতবাদের ধারক কেমন করে হতে পারেন।

আমাদের দেশের চরম বামপন্থী নেতারাও আল্লাহয় বিশ্বাসী। তারা অসুস্থ হলে আল্লাহর নিকট দোয়া করার জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন জানান। তাদের কেউ মারা গেলে জানাযার নামাযের ব্যবস্থাও করেন। আল্লাহর প্রতি তাদের ঈমান আছে বলেই এ সব থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়।

তাদের নিকট আমার প্রশ্ন হলো যে, তারা কুরআনকে আল্লাহর কিতাব বলে বিশ্বাস করেন কিনা? যদি করেন তাহলে কুরআনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক আয়াতগুলো মেনে নিতে কেমন করে আপত্তি তোলেন?

কুরআনে ও হাদীসে আল্লাহর যে পরিচয় রয়েছে ঐ আল্লাহকে তারা যদি বিশ্বাস করেন তাহলে তাদের আচরণ এমন হওয়ার কথা নয় যেমন তারা করছেন। আল্লাহ নিজে তাঁর যে পরিচয় ও গুণাবলী কুরআনে দিয়েছেন সে আল্লাহকে বিশ্বাস না করলে তাদের এ বিশ্বাস অর্থহীন।

কুরআনের আল্লাহ শুধু একটু বিশ্বাস ও ভক্তিতে মোটেই সন্তুষ্ট নন। তিনি চান তার দ্বীনের পূর্ণ আনুগত্য যার নমুনা তাঁর রাসূল (সাঃ) বাস্তবে দেখিয়ে গেছেন।

www.amarboi.org

আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১

বিক্রয় কেন্দ্র

৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার,
(ওয়ারলেস রেলগেট)
ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩৯৪৪২

১০, আদর্শ পুস্তক বিপণী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।